ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-2-8 পত্র— 'প্রাগাধুনিক সাহিত্য-২'-এর মডিউল-৩-এর পঠিত বিষয়—

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (দেববন্দনা থেকে অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা পর্যন্ত)।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় প্রদান। এখানে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনায় মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কবিকৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই কাব্যের ভাষা ও রচনাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন এই কাব্য 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো' উজ্জ্বল ও কারুকার্যময়। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ড অবলম্বনে ভাষার ব্যবহারে, ছন্দ নির্মাণে, অলংকার প্রয়োগে, প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীলতায় কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিত জানার জন্য শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'কবি ভারতচন্দ্র', দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজসভার কবি ও কাব্য', ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত প্রমথ চৌধুরীর বিভিন্ন প্রবন্ধ, জয়িতা দত্ত সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি

সহযোগী অধ্যাপক,

বাংলা বিভাগ

ও

বারসার,

আশুতোষ কলেজ।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

'অন্নদামঙ্গল' (প্রথম খণ্ড) কাব্য – 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র ন্যায় কারুকার্যময় ও উজ্জ্বল

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য-ধারার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে এক পরিবর্তমান যুগ-পরিবেশে এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিল কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও রসচেতনার প্রকাশ ঘটেছিল তা এক কথায় অনন্যসাধারণ। বাক্ ও বুদ্ধির চাতুর্যে তিনি গতানুগতিক বিষয়বস্তুকে নাগরিক জীবনের চাকচিক্যময় আড়ম্বরে মণ্ডিত ক'রে নিজস্ব অনন্য শিল্প নৈপুণ্যে 'ভাষার তাজমহলে' রূপায়িত করেছিলেন – রচনা করেছিলেন 'নূতন' এক মঙ্গল কাব্য – 'অন্নদামঙ্গল' (প্রথম খণ্ড) কাব্য। ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ করেই তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'কবি সংগীত' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন –

> ''রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন
> তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।''

আসলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যে দু'টি দিক থাকে – 'Content' বা বিষয়বস্তু ও 'Form' বা আঙ্গিক। ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই 'Content' যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে 'অশ্লীল' – কিন্তু তাঁর কাব্যের 'Form' – 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো'। যাকে এখানে 'Form' বলা হল, তা যেন 'Style'-এরই অন্য নাম। আর এই 'Form' বা 'Style' নির্ভর করে রচনার ভাষা রীতি, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ ঝংকার, অলংকারের বিদ্যুচ্ছটার উপর। আর এইসব কিছুই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (প্রথম খণ্ড) কাব্যে স্পষ্টই খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

(ক) ভাষা ব্যবহারে কবির অনন্যতা –

কবি ভারতচন্দ্র বহু ভাষাবিদ্ কবি – বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দি, পস্তু প্রভৃতি বহু ভাষায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাই কাব্যকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে এই সকল ভাষার বিচিত্র শব্দকে তিনি ব্যবহার করেছেন – কাব্যের সিদ্ধি যে রসসৃজনে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কবি বলেছেন –

> ''না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
> অতএব কবি ভাষা যাবনী মিশাল।।
> প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
> যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।।''

অর্থাৎ, প্রসাদ গুণযুক্ত রসসিক্ত কাব্য রচনার জন্যই কবি 'যাবনী মিশাল' ভাষা প্রয়োগ করেছেন – শব্দ সংযোজনেই তার প্রমাণ লক্ষ করা যায়। বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দচয়ন করে কাব্যভাষা নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। যেমন – দেবমাহাত্ম্য প্রকাশে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে গুরুগম্ভীর ভাষা সৃষ্টি করেছেন – দেবদেবীর 'বন্দনা' অংশে – 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্‌যোগ', 'অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধারণ', 'অন্নদার মোহিনী রূপ' – প্রভৃতি অংশ উল্লেখনীয়। 'গীতারম্ভে' কবি মহামায়া অন্নপূর্ণার প্রকৃতি বর্ণনায় বলেছেন –

> ''অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
> পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
> অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
> সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি।।''

কিংবা শিবের রুদ্র রূপ প্রকাশে – 'শিবের দক্ষালয় যাত্রা' অংশে –

> ''মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
> ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা-ঘোর বাজে।
> লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
> ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলঙ্কল্ তরঙ্গা।।''

লৌকিক শব্দের রমণীয়তাও তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায় – 'কন্দল ও শিবনিন্দা'য় দেখা যায় –

> ''আই আই ওই বুড়া কি
> এই গৌরীর বর লো।
> বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
> হৈল দিগম্বর লো।''

আবার 'যাবনী মিশাল' ভাষায় কবির সরস বর্ণনা লক্ষ করা যায় – 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশে –

''ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার।।
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ।।''

– এভাবেই দেখা যায়, ভারতচন্দ্র যথার্থই শব্দ-সিদ্ধ কবি। ভাব অনুযায়ী ভাষা বা শব্দ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত এবং রসাত্মক বাক্য রচনায় তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি সত্যিই প্রশংসনীয়।

খ) ছন্দ-নির্মাণে কবির মৌলিকতা –

ভারতচন্দ্র ছন্দ-সচেতন কবি। শব্দের বৈভব ও ছন্দের গৌরব তাঁর কাব্যের পাঠককে বিস্মিত করে। প্রচলিত ছন্দকে অবলম্বন করলেও তারই মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব কবি দেখিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। ছন্দ সৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা তাঁর কাব্যে অন্তত ৮ প্রকারের বাংলা ছন্দ ও ১০ প্রকারের সংস্কৃতানুগ ছন্দ এবং সেগুলির অভিনব শিল্পচাতুর্যও লক্ষণীয়। যেমন –

বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্যসাধন –

কবি তাঁর কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, একাবলী, মালঝাঁপ, ধামালী, দিগক্ষরা – প্রভৃতি বাংলা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি পয়ারের ৮+৬-এর বন্ধন ভেঙে ৭+৭ মাত্রার পয়ারও রচনা করেছেন –

''কান্দে মেনকা রানী ।চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে ।নারদ মুনি হাসে।।'' ৭+৭

পয়ারের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম কিছু প্রবহমানতা এনেছিলেন কাব্যে –

''চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ।।''

আবার স্বরবৃত্তে লেখা লৌকিক ধামালি ছন্দের প্রয়োগও অপরূপ –

''আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।''

সংস্কৃতানুগ বাংলা ছন্দ নির্মাণ –

কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের বাংলা প্রয়োগেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন – 'অন্নদামঙ্গল' (প্রথম খণ্ড) কাব্যে এই ধরনের চারটি সংস্কৃতানুগ বাংলা ছন্দ রয়েছে, যথা – 'ভুজঙ্গপ্রয়াত', 'তূণক', 'তোটক' ও 'তামরস'। যেমন – 'শিবের দক্ষালয় যাত্রা' অংশে শিবের রুদ্রমূর্তি প্রকটিত হয়েছে 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' ছন্দের ব্যবহারে –

''ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গানে।।
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটাকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা।।''

আবার 'তূণক' ছন্দে 'দক্ষযজ্ঞনাশ' - অংশে দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ডের অপরূপ বর্ণনা ফুটে উঠেছে –

''মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দূপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে।।''

গ) অলংকার-প্রয়োগে কবির নৈপুণ্য –

রূপদক্ষ কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে নানা আভরণে সযত্নে সাজাতে গিয়ে অলংকার প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন শব্দালংকার, তেমনই অর্থালংকার – উভয় ক্ষেত্রেই কবি সপ্রতিভ। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, বিরোধ, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারে ভারতচন্দ্র সাবলীল। যেমন –

অনুপ্রাস – 'যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অউ অউ হাসিছে'
'কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে'

যমক – ‘ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুনে।’
‘ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।’

শব্দালংকার – এর পর অর্থালংকারেও কবির নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় –

উপমা – ‘বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির’।

উৎপ্রেক্ষা – ‘ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে।’

ব্যতিরেক – ‘কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।।’

ব্যাজস্তুতি – ‘কুকথার পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।’

– অলংকার প্রয়োগের নিপুণতায় ভারতচন্দ্রের কাব্য সত্যিই শব্দনগরীর তাজমহল হয়ে উঠেছে।

ঘ) প্রবাদ ও প্রবচনের ব্যবহারে কবির সার্থকতা –

ভারতচন্দ্র জীবন-অভিজ্ঞ কবি। তাঁর সেই বহুদর্শী, বিচিত্রবর্ণা অভিজ্ঞতার কোনো কোনো ভাবনাকে তীক্ষ্ণ তীব্র মার্জিত শব্দে তিনি প্রকাশ করেছেন। আর সেগুলিই পরবর্তীকালে বহু প্রচার ও ব্যবহারে প্রবাদ হয়ে উঠেছে। সেই প্রবাদগুলিতে তাঁর জীবন-ভাবনা, ঐতিহ্য প্রীতি, সাংস্কৃতিকচেতনা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই সেগুলি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্তর্লোক ও বহির্জীবনের নানা পরিচয় প্রকাশ করেছে। নিম্নে কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করা হল। যেমন –

(i) ‘হা ভাতে যদ্যাপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।’

(ii) ‘বড়র পীরিতি বালির বাঁধ / ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।’

(iii) ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’

(iv) ‘মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।’

(v) ‘বিধাতার লিখা কাহার সাধ্য খন্ডি।’

প্রবাদ ও প্রবচন অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক হলেও বিশিষ্ট সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ‘কবি ভারতচন্দ্র’ গ্রন্থে ‘প্রবচন’ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> ‘‘উজ্জ্বল বাক্যাংশ, যা কবি হয়ত নিজের মুখে বা তাঁর চরিত্রের মুখে বিশেষ পরিস্থিতিতে বসিয়েছেন, যাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব – তাকেই প্রবচন বলতে চাই।’’

এই অর্থে কিছু বিশিষ্ট প্রবচন ভারতচন্দ্রের কাব্যে রয়েছে। যেমন –

(i) ‘যে গাবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে।’

(ii) ‘নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা।’

(iii) ‘অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে, এ বড় মায়ার পরমাদ।।’

(iv) ‘চেতনা যার চিত্তে সেই চিদানন্দ।’

(v) ‘ভবঘোর পারাবার, হরিনাম তরী তার।।’

‘অন্নদামঙ্গল’ (প্রথম খণ্ডে) কাব্যে এই ভাষা-ছন্দ-অলংকার-প্রবাদ প্রতিম বাক্যের সমাহারে কবি ভারতচন্দ্র এমন এক আকর্ষণীয় কবিভাষা নির্মাণ করেছেন, যার আকর্ষণ অমোঘ। তাই সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, ভারতচন্দ্রের হাতে ও কাব্যে ‘Knowledge’ ও ‘Art’ দুই-ই আছে। তিনি তাঁর ‘The Story of Bengali Literature’ – নামক ইংরেজি প্রবন্ধে তাই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মন্তব্য করেছেন –

> “Our people did not know what a plastic material they had in their language, till Bharatchandra moulded it into shapes of perfect beauty, so firm in outline, so symetrical in structure. Bharatchandra as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.”

রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র রাজকীয় মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর বৈদগ্ধ্য ও অভিনব রসচেতনায় ‘অন্নদামঙ্গল’ (প্রথম খণ্ড) কাব্যকে ভাষা-ছন্দ-অলংকার-প্রবাদের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছেন। মণিমালার মতোই তাঁর কাব্যে শিল্পচাতুর্যের ঝলকানি - বহু মূল্য আলংকারিক প্রসাধন-আঙ্গিক ঐশ্বর্য। আর সেজন্যই ‘অন্নদামঙ্গল’ (প্রথম খণ্ড) কাব্য যথার্থই ‘রাজকণ্ঠের মণিমালা’র ন্যায় কারুকার্যময় ঔজ্জ্বল্যতা লাভ করেছে।